সায়েম সাবু

যেখানে মন হারালে সাধন মেলে

দুপুরের পর ঝুম বৃষ্টি হয়েছে। পুব আকাশে খানিক কালো মেঘ থাকলেও গোটা আকাশ খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের দখলে। শরৎ বিকালের যে রূপ, এদিনেও তার দেখা মিলছে। আকাশের উচ্চতাও বাড়িয়েছে নীল আর সাদায় মিলে।

নবগঙ্গা নদীর কালনী ঘাটটি একেবারেই লোকালয়ের মধ্যে বলা যায়। নামের সঙ্গে ঘাট আর নদীর রূপে অসম্ভব মিলও রয়েছে। নদীতে স্রোতের টান কম। পানি প্রায় দু'কূল উপচে পড়ছে। উত্তরের বানের পানি নবগঙ্গায় মিশে একাকার। এতেই পূর্ণ যৌবনে ফিরেছে নদীবক্ষ।

ভ্রমণ

ঘাট পারাপারের জন্য জনাকয়েক অপেক্ষা করছেন এপারে। গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া হয়ে ওসি অফিসের সামনে থেকে উল্টো দিকে কালনী ঘাটের সড়ক। অটোরিকশায় আসতে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার পথ। মধুমতি নদী পার হতেই নড়াইল জেলার সীমানা। এরপর নবগঙ্গা। জনপ্রতি তিন টাকা নিয়ে স্যালো নৌকায় ঘাট পার করে দেয় মাঝিরা।

এপারে এসেই যেন কবিয়াল বিজয় সরকারের সুর-ছন্দের আবহে প্রকৃতি রূপের দেখা মেলে। সূর্য রক্তিম হয়েছে সবে। গ্রাম চিড়ে বয়ে চলা নবগঙ্গার দূরপ্রান্ত সূর্য ডোবার সকল আয়োজন চলছে। শেষ বেলার সূর্য কিরণ এসে ঢেউয়ে মিলে খেলা করছে। তাতে পানিতে রুপা ফলছে, আবার ঢেউয়েরা কখনও কখনও রঙিন হয়ে উঠছে।

দিবসের এমন অন্তিমকালে সাধক বিজয়ের লেখা-

"কবে আমার তীরে ভিড়াবে নাও
ধীরে ধীরে বাইয়ারে,
ওরে আমার জীবন নদীর নাইয়ারে"

গানটির সুর যেন দূর প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে। নদীতে মাছ ধরার ছোট ছোট ডিঙায় ভর করে জেলেরা জাল ফেলছে। রাতে জেলেদেরই দখলে থাকবে নবগঙ্গা।

নয়ন ভেজা জলসায় বিজয় প্রেমের কীর্তন

নবগঙ্গা নদী পার হয়ে গোবরা গ্রামে আসতে ভ্যান-ই প্রধান বাহন। তবে অটোরিকশাও হয়েছে এখন। আরও দ্রুত আসতে চাইলে মোটরসাইকেল ভাড়া করতে হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল বলে ভরসা হল মোটরসাইকেলে। মিনিট বিশেক চালিয়ে গোবরা বাজারে নামিয়ে দিল চালক।

গ্রামের মধ্যখানে ছোট্ট বাজার। সন্ধ্যাবাতি জ্বলতে শুরু করেছে দোকানে দোকানে। বিকালের বৃষ্টি তখনও ভিজিয়ে রেখেছে পাকা সড়কটি। বাজার থেকে তীর ছোড়া দূরত্বে চিত্রা নদী। চিত্রার অপরূপ চিত্র চোখে না দেখলে বোঝানো দায়। নদীরূপ নড়াইলের এই পল্লীপ্রান্তকে যে কীভাবে সাজিয়েছে, তার প্রমাণ মিলছে চিত্রার দু'কূলে।

বাজারে নেমে বাউল বিজয় সরকারের শিষ্য প্রভাত বালার বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতেই একজন হাঁক ছেড়ে বললেন, 'ও ঠাকুর, তোমার কুটুম এসেছে গো'। প্রভাত বালা অপেক্ষা করছেন বিকাল থেকে। প্রভাত বালার ছেলে প্রতাপ বালাই আমাদের পাঠিয়েছেন। প্রতাপ বালার সঙ্গে পরিচয় টুঙ্গিপাড়ার ঘোনাপাড়ায় টমা গ্রুপের ক্যাম্পে। প্রতাপ বালা সেখানে রেলপথ নির্মাণে ভারী যান চালান।

ক্যাম্পে রাতের বেলায় বিজয় সরকারের কথা উঠতেই যেন চমকে উঠলেন প্রতাপ বালা। বললেন, 'দাদা বিজয় সরকারের বাড়ি যাবেন? আমার বাবা আপনাকে নিয়ে যাবেন। বাবা বিজয় সরকারের একজন শিষ্য। বিজয় সরকারের গান নিয়েই বাবা বেঁচে আছেন। আপনি চলুন, বাবাই সব ব্যবস্থা করবেন।' আমাদের ঘুমে রেখে সকালেই প্রতাপ বালা অফিস থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছেন নড়াইলের গোবরা গ্রামে।

প্রভাত বালার আধা কাঁচা চুল। গলায় তুলসী মালা। গেরুয়া রঙের ফতুয়া। ধুতি পরেছেন বেশ পরিপাটি ঢঙে। হাতে কাঠের ডাটের ছাতা। পরিচয় পেয়েই পরম বিনয়ে প্রণাম করতে চাইলেন প্রভাত বালা। বয়সে ছোট বলে তার অমন সৌজন্যবোধে মনে অস্বস্তি ঠেকছিল।

আকাশ মেঘলা দেখে কথা না বাড়িয়ে রওনা দিলেন সঙ্গে নিয়ে। প্রভাত বালার মধ্য বয়স পার হয়েছে আরও কয়েক বছর আগে। তবে শরীরের কাঠামো বেশ সুঠাম। খেত-খামারেই যে জীবনের ঘানি টানছেন, তা শরীর-ই বলে দিচ্ছে। রোদে পুড়ে চামড়া প্রায় কুচকুচে কালো। হাঁটার গতি ধীর।

খানিক হেঁটেই রাস্তার মোড়ে বটতলায় ডা. খোকন বিশ্বাস নামের এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা। আলাপ তুললেন, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে খোকন বিশ্বাসের গ্রামের মন্দিরে কীর্তনের আয়োজন প্রসঙ্গে। পরের দিন ওই অনুষ্ঠানে প্রভাত বালা-ই গাইবেন বলে জানালেন খোকন বিশ্বাস। তবে তাতে আপত্তি জানালেন প্রভাত বালা। বললেন, সাংবাদিকরা (পরিচয় করিয়ে দিয়ে) ঢাকা থেকে এসেছেন। তাদের নিয়ে ডুমদি গুরুর (বিজয় সরকারের বাড়ি) বাড়ি যাব।

বিজয় সরকারের নাম মুখে আনতেই খোকন বিশ্বাসের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। গলাও ধরে আসল। প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে হাতের জামা তুলে দেখালেন খোকন বিশ্বাস। গায়ের প্রতিটি লোম দাঁড়িয়ে গেছে। চোখ ছলছল। কথাও সরছে না। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বিজয়! ও নাম শুনলে বোধ থাকে না গো। দেহ-মন মূর্ছা যায়। হরি নামের কীর্তন এ ধরায় আর ওভাবে কে গাইতে পারে?'

হিন্দুপাড়ায় বেশ শিক্ষিতজন নামে পরিচিত খোকন বিশ্বাস। বয়স হলেও শব্দ ও ভাষা প্রয়োগে বেশ দখল রয়েছে তার। বিজয় প্রেমে আসক্ত এই শুদ্ধ পুরুষ বলছিলেন, 'শৈশব থেকেই বিজয়বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য হয়েছে আমার। স্বয়ং ঈশ্বরের কৃপা না থাকলে কেউ অমন বাণী রচনা করতে পারেন না। আহা! কী সুর! সুরে কী মধু! প্রতি বছর গ্রামের কীর্তনে গাইতেন বিজয় সরকার। একালে তার মতো প্রজ্ঞাবান বাউল কবির দেখা পাওয়া ভার। কোনো কোনো বছর একাধিকবার গাইতে আসতেন বিজয় সরকার। দূর গ্রামের কোথাও তার গান হলে আমরা দল বেঁধে যেতাম। কৈশোর, যৌবন এমনকি পরিণত বয়সেও বিজয় সরকারের স্বকণ্ঠে গান শোনার সুযোগ হয়েছে। ভারতে চলে যাওয়ার পরও আমাদের গ্রামে কয়েকবার কবি গান গাইতে আসেন। তাকে ঘিরেই আমাদের যত আয়োজন চলত। বিজয় সরকারের সমীপে ভক্তিকথা বলে কখনও প্রাণ জুড়াবে না আমার।'

বটতলায় দাঁড়িয়ে ১০ মিনিটের আলাপ খোকন বিশ্বাসের সঙ্গে। আর তাতেই যেন বিজয় সরকারের সৃষ্টিকথার সমস্ত ডালা মেলে ধরলেন। জন্মাষ্টমীর ওই অনুষ্ঠানে তার মন্দিরে প্রভাত বালা গাইবেন বলে আশ্বস্ত করে খোকন বিশ্বাসের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

প্রভাত বালার পায়ে তাল মিলিয়ে কয়েক কদম ফেলতেই কাদাপথে পা রাখতে হল। সাবধান করে দিলেন প্রভাত বালা। বললেন, 'বাড়ি যেতে খুব কষ্ট হবে গো। গ্রামের ওই প্রান্তে বাড়ি। সমস্ত রাস্তাই কাদায় ভরা। এ বাড়ি ও বাড়ির উঠান-আঙ্গিনা মাড়িয়ে যেতে হবে। আমাদের হিন্দুপাড়া। আমাদের ভোট নিয়ে রাজনীতি হয়। কিন্তু গ্রামের উন্নয়ন হয় না।' একটি বাক্যেই হাজারও ক্ষোভের প্রকাশ।

কাদামাটি বটে। তবে গাও-গ্রামের সত্যিকার যে রূপ তার কোনোটিরই ঘাটতি নেই দক্ষিণ গোবরার এ পাড়ায়। মাটির ঘ্রাণে মন ছুঁয়ে যাচ্ছিল। কাদা মাড়িয়ে রাস্তা পার হতে পারলেও বাড়িগুলোর উঠান পার হওয়া ছিল প্রায় দুঃসাধ্য। শ্যাওলা জমে ভয়ঙ্কর পিচ্ছিল প্রতিটি উঠান।

পাড়ার একটি পুরনো বাড়ির এমন উঠানের মাঝখানেই শান বাঁধানো তমাল গাছ। গাছের বয়স কত, তা পাড়ার কেউ আর বলতে পারে না। প্রভাত বালার বাপ-দাদারাও নাকি অমন রূপ দেখেছেন গাছটির। শান বাঁধানো গাছের গোড়ায় কয়েকটি ঘটিবাটি। অন্যদিনের মতো আজও সন্ধ্যাপূজা মিলেছে তমাল তলায়। সবুজ পাতায় পুরো বাড়ি ছেয়ে রেখেছে একটি গাছই। প্রকাণ্ড গাছটির আগা-গোড়াই কালো। পাড়ার হিন্দু সম্প্রদায় এ গাছেই নাকি শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখতে পান।

প্রতি বছর ফাল্গুনে দোল উৎসব হয় তমাল তলায়। তমালের বাহু ভেদ করে নিমের গাছটি উঠে গেছে মগডাল বরাবর। নিমের আশীর্বাদ জানে সবাই। নিমে-তমালে মিলে যেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল মিলন ঘটেছে এ পাড়ায়। প্রভাত বালার সাবধানে চলার পথ অনুসরণ করে অবশেষে কাঙ্ক্ষিত বাড়ির দেখা মিলল। আয়োজনের কোনও ঘাটতি ছিল না গৃহকর্ত্রীর। রাতের খাবার সেরে আর সময় নিলেন না প্রভাত বালা। বারান্দাতেই পাটি বিছিয়ে জলসার আয়োজন। ছেলে প্রতাপ বালা ঢোলে ঝড় তুললেন। হারমোনিয়ামে নিপুণ হাতে সুর ব্যঞ্জনার বিকাশ ঘটাতে থাকলেন প্রভাব বালা নিজেই। আর তার স্ত্রী টুনি বালা মন্দিরায় তাল মেলালেন।

'তুমি জানো নারে প্রিয়, তুমি মোর জীবনের সাধনা' সাধক বিজয় সরকারের সেই বিখ্যাত গান দিয়েই আসর শুরু করলেন। বিজয় সরকারের কাছ থেকে শুনেই প্রথম গানটিই শিখেছিলেন প্রভাত বালা। সব আবেগ ঢেলে দিয়ে সুর-ছন্দে আসর জমালেন অল্প সময়েই। ততক্ষণে ঢোলের বাড়ি পৌঁছেছে পাড়ার অন্য ভক্তদের কানেও। বিজয়ের ভক্তরাও এসে আসরে অংশ নিলেন।

এরপর শুধুই গান আর গান। বিজয়ের মহাজনী বাণীতে এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হল আসর ঘিরে। যিনি গাইছেন তারও চোখ ছলছল, আর যারা শুনছেন তাদেরও চোখ ছলছল। এভাবেই মধ্য রাত গড়িয়ে গেল। সেই ভুবন ভোলানো আসরে প্রভাত বালার কণ্ঠে শুধু বিজয় সরকারের সুর-ই যে ভর করেছিল, তা অন্যরাও জোর দিয়ে বললেন।

বাড়ি নয়, যেন সাধনকুঞ্জ

"এই পৃথিবী যেমন আছে তেমন পড়ে রবে
সুন্দর এই পৃথিবী একদিন ছেড়ে যেতে হবে।"

কবিয়াল বিজয় সরকারের অমর বাণী। এমন আধ্যাত্মিক আর ভাববাদী গানেই মানুষ সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। দুনিয়াবি মোহ ছেড়ে পরমাত্মায় মন সপে দিতে ভাবসাগরে তরী ভাসায়। সুফি বা বৈষ্ণববাদের ধারা থেকেই বাউলতত্ত্বের উদ্ভব বলে মনে করা হয়। আর বৈষ্ণববাদী বাউলকূলে কবিয়াল বিজয় সরকার হচ্ছেন প্রাণ পুরুষ।

সাধুজন বলেন, পরমাত্মায় আত্মা মেলাতে সাধন-ভজনে মন বসাতে হয়। আর সাধনার জন্য প্রকৃতির সঙ্গেই নাকি বাসা বাঁধতে হয়। সাধক বিজয় সরকার তেমন-ই এক বাসা বেঁধেছিলেন, যা ছিল তার 'সাধনকুঞ্জ'।

গোবরা গ্রাম থেকে খানিক দূরেই চিত্রানদী। এরপর উজিরপুর। উজিরপুর হয়ে নড়াইল সদর ছেড়ে কবিয়ালের বাড়ি আসতে প্রায় ১৪ কিলোমিটার পথ। দ্রুত আসতে চাইলে মোটরসাইকেল ভাড়া নিতে হয়। এ বাহনে আধা ঘণ্টাতেই ডুমদি গ্রামের সীমানা মেলে। খানিক গিয়ে মোটরসাইকেল রাখতে হয়। এরপর পায়ে হেঁটে কাদা-পানি মাড়িয়ে প্রায় আধা মাইল গেলেই বিজয় সরকারের বাড়ি।

বিলের মাঝখানে ৫২ শতাংশ ভিটার ওপর ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে বিজয় সরকারের হাতে গড়া সেই পুরনো ভবনটি। ভবনের দুটি কক্ষ। কেউ আর থাকে না তাতে। ভবনের পলেস্তারা খসে ইট বাইরে চলে এসেছে। বারান্দাতেও বেশ কয়েকটি গর্ত। চালের টিন ফুটো হয়েছে আরও আগেই। কাঠের দরজায় বাইরে থেকে কঞ্চি দিয়ে খিল দেয়া। বিজয় সরকার যে কক্ষে শয়ন করতেন, সেখানে একটি খাট প্রায় ভঙ্গুর হয়ে পড়ে আছে। অপর কক্ষে কী সব রাখা আছে, তাতে মানুষের ঢোকার জো নেই। বারান্দা ঘেঁষে একটি ছোট মন্দির। মন্দিরের পাশে কামেনি আর জবা ফুলের গাছ। সামনে কয়েকটি গাঁদা ফুলের গাছও আছে। এখান থেকেই ফুল তুলে পূজা মেলে মন্দিরে। শেষ কবে পূজা হয়েছিল মন্দিরে, যিনি পূজাপর্ব সারেন তিনিই বলতে পারবেন। পূজার ফুলগুলো শুকিয়ে থালায় মিশে গেছে। বিজয়ের কোনো এক কালের একটি ছবি পড়ে আছে মেঝেতে। তবে বিজয় সরকার ব্যবহৃত এক জোড়া খড়ম (চটি) কাচের বাক্সে রাখা আছে। পূজা মেলে বটে, তাতে অবহেলা আর অযত্ন যে আছে, তাও বুঝতে কষ্ট হল না।

যত্ন করবেই বা কে? ভিটার এক কোণে থাকেন বিজয় সরকারের চাচাতো ভাই নটবর অধিকারীর এক মেয়ে ও মেয়ের জামাই। তাদের ঘরে ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনিও আছেন। নুন আনতে পান্তা ফুরায় তাদের। পূজা-অর্চনার চাইতে পেটপূজাতেই ব্যস্ত থাকেন তারা।

উঁচু-নিচু ভিটাটি আগাছায় ভরা। বনোজ গাছও আছে কয়েকটি। বেশ কয়েকটি গরু ঘাস খাচ্ছে ভিটার নানা প্রান্তে। ঘরের পেছনে একটি খেজুর গাছ, যেটি কবিয়ালের নিজ হাতে লাগানো। বিজয় সরকারের বাড়ির কাছে কয়েক ঘর নমশুদ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের। সব মিলে ২০ ঘর হবে হয়ত।

দেশ ভাগের আগে এখানে এক ঘর মুসলমানও ছিল না। বিজয় সরকারের বাড়ির আশপাশেই পাঁচটি পাড়া ছিল হিন্দুদের। দেশ ভাগ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পাঁচটি পাড়াই উধাও হয়েছে। মুসলমানদের কাছে ভিটামাটি বিক্রি করে সবাই ভারতে চলে গেছেন।

স্বাধীনতার পাঁচ কি ছয় বছর পর ভারতে চলে যান বিজয় সরকারও। তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সবাই প্রায় ওপারে। ছেলে কাজল আর বাদল একবার এ দেশে এসে বাবার ভিটা দান করে গেছেন বিজয় সংসদকে। নড়াইল পৌরসভার দেখভাল করার থাকলেও, তাদের কোনো নজর আছে বলে মনে করার কারণ নেই।

ভিটা ঘুরে দেখার একপর্যায়ে সঙ্গ দেন বিজয় সরকারের ভাতিজি জামাই বিমল সিকদার। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া অবস্থা। পরিত্যক্ত ভবনটির বারান্দায় বসেই কথা হয় বিমল সিকদারের সঙ্গে। বলেন, 'আমার শ্বশুর মশাইরা ভারতে চলে যাওয়ার পর আমি এখানে এসেছি। যে চেয়ারে বসে কথা বলছি, এটিতেই বসতেন বিজয় সরকার। তার গান লেখা ছিল সাধনার মধ্য দিয়ে। হারিয়ে থাকতেন দিনের পর দিন। এই যে বিল দেখছেন, তার মাঝখানে নৌকা বেঁধে গান লিখতেন। সাধন-ভজন কাকে বলে, তা বিজয় সরকারের মাঝে দেখেছি। অমন সাধক পুরুষ আর মিলবে না এ জনমে।'

সাধক বিজয় সরকারকে স্মরণ করতে গিয়ে এই বৃদ্ধ বাউল ধারার সোনালি দিনের নানা গল্প শোনালেন। শোনালেন, বিজয়কে ঘিরে ভক্তদের নানা উপাখ্যানও।

দীর্ঘ আলাপের বিদায় বেলায় বিজয় সরকারের সেই বিচ্ছেদের গানে গুনগুনিয়ে সুর দিলেন বিমল সিকদার। 'আর কি ফিরে পাবো রে, যারে হারায়েছি জীবনে।'

সাধনেই বিজয়

কবিয়াল বিজয় সরকার ১৯০৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইলের ডুমদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মায়ের দেয়া নাম ছিল বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী। ভক্তকূলের কাছে তিনি পাগল বিজয় নামেই পরিচিত।

জীবনের শেষ বেলা পর্যন্ত গান সাধনাতেই কাটিয়েছেন তিনি। তার জনপ্রিয় কয়েকটি গানের মধ্যে রয়েছে- 'এ পৃথিবী যেমন আছে, তেমনই ঠিক রবে, সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে', 'পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী, একদিন ভাবি নাই মনে', 'তুমি জানো না রে প্রিয়, তুমি মোর জীবনের সাধনা', 'আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে' এবং 'আর কি ফিরে পাবোরে'।

সাধক বিজয়ের বাবার নাম নবকৃষ্ণ বৈরাগী, মাতার নাম হিমালয় কুমারী। পিতামহের নাম গোপালচন্দ্র বৈরাগী। বিজয় সরকার স্থানীয় টাবরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াকালীন নেপাল বিশ্বাস নামক এক শিক্ষকের কাছে যাত্রাগানের উপযোগী নাচ, গান ও অভিনয় শেখেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তিনি বেশ কয়েকটি স্কুল পরিবর্তন করেন। প্রায় সবখানেই তিনি এমন এক বা একাধিক শিক্ষক পান, যাদের কাছে তিনি গান শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারানোয় পড়ালেখা বেশি দূর এগোয়নি। দশম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি লেখাপড়া করেন।

বিজয় সরকার স্থানীয় স্কুলেও কিছুদিন শিক্ষকতা করেন, নায়েবের কাজও করেন। পাশাপাশি তিনি নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের লোক ও আধুনিক গানচর্চা করতে থাকেন। ১৯২৫ সালে তিনি গোপালগঞ্জের কবিয়াল মনোহর সরকারের কাছে কবিগান শেখেন। কিছুদিন পর তিনি রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সংস্পর্শে আসেন এবং তার কাছেও কবিগানের তালিম নেন।

১৯২৯ সালে বিজয় সরকার নিজের একটি গানের দল করেন এবং কবিয়াল হিসেবে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি গান লিখে নিজেই সুর করতেন। রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদদীন, আব্বাসউদ্দীন আহমদ প্রমুখের সাক্ষাৎও পান জীবনের নানা সময়ে।

বিজয় সরকার প্রায় ৪০০ সখি সংবাদ ও ধুয়া গান রচনা করেন। এর মধ্যে কিছু কাজ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং রেডিও-টেলিভিশনেও কবিগান পরিবেশন করেন।

বাংলাদেশ ও ভারতে তিনি আনুমানিক চার হাজার আসরে কবিগান পরিবেশন করেন। এছাড়া তিনি রামায়ণ গানও পরিবেশন করতেন।

বিজয় সরকারের পারিবারিক উপাধি ছিল বৈরাগী। তিনি নিজে বৈরাগী ত্যাগ করে অধিকারী উপাধি গ্রহণ করেন। কবিয়াল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করায় তিনি সরকার উপাধি পেয়ে পরিচিতি পান। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করে।